193

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 19 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪ ...

# শিক্ষাঙ্গনে ভাষা শিক্ষার দুর্গতি

নাসির আহমেদ

ব্যাপক উদ্যোগ আয়োজন আর আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে মাসখানেক হলো অতিক্রান্ত হয়েছে অমর একুশে। ফেব্রুয়ারি এলে মাতৃভাষা বাংলার উন্নয়নের স্বপ্ন অত্যন্ত জোরালোভাবেই আমাদের মনে মেলে দেয় তার ডালপালা। কিন্তু ফেব্রুয়ারি শেষে শীতের ঝরা পাতার মতোই ঝরে যায় মাতৃভাষার উন্নয়ন চিন্তা তথা ভাষাপ্রীতি। এবারও যথারীতি তাই হয়েছে। অথচ ফেব্রুয়ারি মাসে কত সেমিনার সিম্পোজিয়াম, কত আলোচনা, উদ্ভাবনা চলে ভাষার ক্রমবিকাশ এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে। বাংলা ভাষার ব্যাপক প্রসার, শুদ্ধতা, সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য কত কী প্রস্তাবই না উথাপিত হয়। কিন্তু সারা বছরে আর ঐসব পরিকল্পনা বা কর্মসূচী বাস্তবায়নের কোন লক্ষণ দেখা যায় না। ফলে মাতৃভাষার চর্চা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকে নিমজ্জিত। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা বাংলায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও তাই ক্রমাগত বেড়েই চলে।

ইন্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী লেবেলের পাঠদান এবং পরীক্ষার সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁরাই সবচেয়ে বেশি করে উপলব্ধি করতে পারেন কী করুণ অবস্থা বাংলা ভাষার। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর এবং বিএ ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্র বিশুদ্ধ বানানে উত্তরপত্র প্রস্তুত করতে ব্যর্থ। শুধু যে বানান বিভ্রান্তি তাই নয়, বাংলা বাক্যও অনেক সময়ই শুদ্ধ করে লিখতে ব্যর্থ হয় অধিকাংশ পরীক্ষার্থী। কোন কারণে যদি মুখস্থ করা প্রশ্নোত্তরের কোন অংশ ভুলে যায়, তাহলে যে নিজের মেধা খাটিয়ে ঐ অপূর্ণতাকে পূরণ করার মতো দু'চারটি বাক্য লিখবে, এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা পাওয়া যাবে খুবই কম। সঙ্গতকারণেই বাংলা বিষয়ের ফলাফল যা হবার তাই হয়। এসএসসি এবং এইচএসসির ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশে আজকাল পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে স্টার কিংবা প্রথম বিভাগ পেয়ে উত্তীর্ণ হচ্ছে। এদেরও সবচেয়ে কম নম্বর দেখা যায় যে বিষয়ে তা হচ্ছে বাংলা। অনেকেই নৈর্ব্যক্তিক অংশে ৫০-এর মধ্যে ৩০/৩৫ পেলেও লিখিত প্রশ্নোত্তর পর্বে ৫০-এর মধ্যে ৫ থেকে ১০ নম্বর পায়।

আর ডিগ্রীর অবস্থা? সেতো সবারই জানা। প্রতিবছরের বিএ পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের ফলাফল জরিপ করলে দেখা যাবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই বাংলায় অকৃতকার্য এবং রেফার্ডও পায় বাংলায় বেশি। ১০০ নম্বরের মধ্যে যারা কোনমতে ২৮ অর্জন করতে পারে, তারাই গ্রেসে পাস করে যায়। কিন্তু গ্রেস সিস্টেম থাকা সত্ত্বেও অকৃতকার্য শিক্ষার্থীর সংখ্যাই অধিক।

বাংলা বিষয়ে ডিগ্রী ক্লাসে এই অকৃতকার্যতার মূল কারণ গোড়ায় গলদ। অর্থাৎ স্কুল থেকে শুরু করে এইচএসসি পর্যন্ত এমনভাবে এরা বাংলা বিষয়ে পড়া শোনা করে আসে যে, নির্ভুল বানান যেমন শেখার প্রয়োজন হয় না, তেমনি প্রয়োজন হয় না সৃজনশীল বাক্য গঠনেরও। নোট মুখস্থ করা বিদ্যায় তারা বৈতরণী পার হয়ে আসে কোনমতে। ফলে বিএ ক্লাসের পরীক্ষার খাতায় কেবল নোট মুখস্থ দিয়ে কাজ সিদ্ধ হয় না। যেহেতু ওখানে সাহিত্যের মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি নির্ভুল বানান ও শুদ্ধবাক্য লেখার শর্তটি অপরিহার্য, সে কারণে অধিকাংশ শিক্ষার্থী বৈতরণী পার হতে ব্যর্থ। ১০০ তে ১০০ নম্বরের উত্তর দিয়ে এসেও ৩৩ নম্বর জোটাতে পারে না। এমন অনেক অকৃতকার্য ডিগ্রী পরীক্ষার্থীর মন্তব্য শুনেছি যে, 'ফুল মার্কস-এর উত্তর দিয়ে এলাম, অথচ কেমন করে যে ফেল করলাম বুঝতে পারছি না।'

সত্যিই বুঝতে পারার কথা নয়। কেননা তারা যে ভুল বানান লিখছে সেটাও তারা জানে না, বাক্য যে শুদ্ধ হয়নি জানে না। মূল বই অনেকেরই পড়া নেই বলে নোটের সাজানো প্রশ্নের মুখস্থ উত্তরে যে কিঞ্চিত ঘুরিয়ে দেয়া প্রশ্নটির উত্তর কাভার করে না, তাও এদের বোঝার কথা নয়। ফলে ফেলের কারণও অজ্ঞাতই থাকার কথা।

উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় শিক্ষার্থীদের এই শোচনীয় অবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিলিমিনারি এবং এমএ ফাইনালেও দেখা যায় প্রকটভাবে। দিনরাত লাইব্রেরি ওয়ার্ক করে যারা নোট তৈরি করে। সেই স্বল্পসংখ্যক সহপাঠীর কাছ থেকে রেডিমেড নোটের ফটোকপি মুখস্থ করে বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের শেষ পরীক্ষা পার হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যাই বেশি। ফলে টিউটরিয়াল পরীক্ষা এবং কোর্স সিস্টেমের সুবিধা কিছুটা কাজে লাগিয়ে বাংলায় এমএ পাস করলেও অনেকেরই বাংলা প্রকৃত অর্থে শেখা হয় না। শুদ্ধ বানানে নির্ভুল বাক্য তারা সারা জীবনেও আর লিখতে পারে না। ফলে এরা যদি শিক্ষকতায় যায় স্কুলে এবং কলেজেও শেখায় ভুল। যত নির্মমই শোনাক না কেন, এ অবস্থা বাংলাদেশের বেশিরভাগ স্কুল ও কলেজে। প্রাইমারির অবস্থা আরও শোচনীয় অথচ প্রাইমারি হচ্ছে শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনের মূল ভিত্তি। সেই ভিত্তিটাই যদি হয় নড়বড়ে, ভুলের কন্টকে আকীর্ণ তাহলে ঐ শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার ভিত্তি কেমন করে হবে স্থায়ী? এই দুঃখজনক বাস্তবতাই ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে।

এর জন্য শিক্ষকদের যেমন এককভাবে দায়ী করা যাবে না। তেমনি দায়ী করা যাবে, না শিক্ষার্থীদেরকেও। এর জন্য দায়ী সামগ্রিক সামাজিক অবস্থা এবং শিক্ষা ক্ষেত্রের নীতি নির্ধারকদের চরম উদাসীনতা। সামাজিক কারণ বলছি এ জন্য যে, মাতৃভাষা বাংলা শুদ্ধ করে শেখানোর ক্ষেত্রে সামাজিক অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে অনেক দিন ধরে। শিশু-কিশোরদেরকে পারিবারিক গণ্ডি থেকেই আগের দিনে সুশিক্ষিত (অন্তত মাতৃভাষায়) করার অবস্থা ছিল। শিশুরা পড়া শেখার আগেই মুখে মুখে শুনত রূপকথা, কল্পকাহিনী, বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনকথা ইত্যাদি। ফলে সাহিত্যপাঠের প্রতি জন্মাতো প্রগাঢ় অনুভূতি। স্কুলের প্রথম শ্রেণীতেই হাতের লেখা সুন্দর করানোর প্রচেষ্টা চালাতেন শ্রেণীশিক্ষক, বাড়িতে মা-বাবা অথবা গৃহশিক্ষক। যে কারণে নন মেট্রিক পণ্ডিত এমন কি পঞ্চম শ্রেণী পাস জিটি শিক্ষকদের কাছ থেকেই শেখা যেত শুদ্ধ বানান, শুদ্ধ বাক্যে এবং ব্যাকরণের জটিল সব নিয়মকানুন। আজ যা বাংলায় এমএ পাস অনেক শিক্ষকের কাছেও শেখা যায় না। জিটি বা গুরু ট্রেনিংপ্রাপ্ত 'পণ্ডিত' শিক্ষকরা এত বিশুদ্ধ বাংলা জানতেন যে, একজন শিক্ষার্থী তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর মধ্যেই ভাষা আর বানানের শুদ্ধতা সম্পর্কে সম্যক অবগত হবার সুযোগ পেত। এ রকম শুদ্ধতার পরিবেশ ষাট দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্তও ছিল। কিন্তু এখন সে পরিবেশ না আছে শিক্ষাঙ্গনে, না আছে পরিবারে। এখন শিশুরা বই পড়ার চেয়ে ভিডিও গেম আর স্যাটেলাইট টিভির অনুষ্ঠানেই তৃপ্তি পায় বেশি। শিক্ষিত পরিবারগুলোতেও আগ্রহ নেই শিশুদেরকে শৈশব থেকেই শুদ্ধভাবে মাতৃভাষা শেখানোর। পাঠ্য পুস্তকের বইয়ের কোন বই পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিরও প্রয়োজন বোধ করেন না অনেকেই। যারা সচ্ছল, বিত্তবান তারা বাংলাভাষা শেখানো তো দূরের কথা, বাংলা মিডিয়াম স্কুলেও ছেলেমেয়েকে পড়াতে আর আগ্রহী নন প্রায়। অনেকেই দেন কিন্ডার গার্টেন ও ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলে। ইংলিশ মিডিয়ামে 'এ' লেভেল, 'ও' লেভেল শেষ করে এরা কেউ হয় ডাক্তার, কেউবা ইঞ্জিনিয়ার, কম্পিউটার বিজ্ঞানী। ফলে পরিণত জীবনে এঁরা বিশেষ বিষয়টুকুই জানেন মাত্র, জানেন না পাঠ্য বিষয়ের বাইরের বিশাল পৃথিবীর কোন কিছু। ফলে এঁরা যেমন সার্টিফিকেটধারী অশিক্ষিত থেকে যান, তেমনি মাতৃভাষায় শুদ্ধ করে একটি চিঠিও লিখতে পারেন না। এমনকি এর জন্য লজ্জিতও হন না।

ফলে মাতৃভাষা বাংলার দুর্গতি কেবল প্রসারিতই হচ্ছে। স্কুলেও ভুল বাংলা শেখা হয়, বাড়িতেও। এই ভুলের বিশাল বিস্তারে মাতৃভাষার করুণ দশা দিনকে দিন বেড়ে চলেছে।

স্কুলে সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতা, সাপ্তাহিক সাহিত্য পাঠের আসর, বইপড়া প্রতিযোগিতা, বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদেরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই উপহার দান এসব দিনকে দিন লুপ্ত হতে চলেছে। ফলে উচ্চশিক্ষিত হওয়া গেলেও আর বাংলা শেখা হয় না। শেখা হয় না পাঠ্য পুস্তকের বাইরের বিচিত্র জ্ঞান-বিজ্ঞানের কিছুই। যে কারণে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে উচ্চশিক্ষিত নন অথচ স্বশিক্ষিত এমন যে কোন ব্যক্তির কাছে এইসব প্রায়-অশিক্ষিত ডিগ্রীধারীদের বিদ্যার মান অত্যন্ত ম্লান।

আজ প্রতিটি অভিভাবক যদি তাঁর শিশুটির লেখাপড়ার সূচনালগ্নেই বাংলা ভাষায় কোন বানানটি ভুল এবং কোনটি শুদ্ধ চিনিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন, যদি প্রাইমারি স্কুলেরই শিক্ষক তাঁর ছাত্রছাত্রীকে জানিয়ে দিতেন যে, 'ষ' এর পরে কখনও দন্ত্য 'ন' হবে না, হবে মূর্ধন 'ণ', যদি শেখাতেন 'তৈরি' ক্রিয়া হলে সব সময় হ্রস্ব (ি) ইকার হবে আর বিশেষণযুক্ত হলে দীর্ঘ (ী) ইকার হবে, (যেমন উলে তৈরী সোয়েটার) তা হলে এই শিশুরা শুদ্ধ বানান শিখেই শিক্ষার উচ্চতর অঙ্গনে যেতে সক্ষম হতো। শুধু তাই নয় পরীক্ষায় 'পাস' আর পথের 'পাশ' বানানের তফাতটিই ক'জন জানেন? জানেন না অনেকেই যে, 'সকল ছাত্রছাত্রীদের' হয় না, হয় সকল ছাত্রছাত্রী। কেন হবে দু'বার বহুবচন? সখ্যকে কেন করা হবে সখ্যতা, উৎকর্ষকে উৎকর্ষতা? হতেই পারে না। কেন হবে না—এ শিক্ষাটা যদি জীবনের সূচনালগ্নেই প্রাইমারি পর্যায়ে দেয়া যেত, তা হলে এই দুর্গতি হতো না। এমনি অসংখ্য জানার কথা অজানাই থেকে যায় শতকরা প্রায় নব্বই ভাগেরও বেশি শিক্ষার্থীর।

নির্মম শোনালেও না বলে উপায় নেই, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যেমন সতর্ক হতে হবে, তেমনি ইতোমধ্যেই নিয়োজিত শিক্ষকদের মাতৃভাষা শুদ্ধভাবে শিক্ষাদানের জন্য একটি জাতীয় ভিত্তিতে পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা করা জরুরী। যাতে তাঁরা নিজেরা শুদ্ধ হতে পারেন আগে। এ কাজটি পিটিআই এবং বিএড, এমএড পর্যায়ে শুরু করা উচিত জরুরী ভিত্তিতে এবং যোগ্য শিক্ষক কমিটি প্যানেল তৈরি করে। এ কাজ জরুরী ভিত্তিতে করা না হলে বাংলা ভাষার দুর্গতি ঘুচতে পারে না।